ভারতে ক্রমবর্ধমান হিন্দুত্ববাদের বিপদ

অনিন্দ্য আরিফ

সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের পাঁচটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হয়ে গেল। নির্বাচনের ফলাফল ভারতের ক্ষমতাসীন সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপির অনুকূলে গেছে। উত্তর প্রদেশে তারা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। উত্তরাখণ্ডেও তাদের জয়জয়কার। পাঞ্জাবে তারা শাসক আকালি দলের সঙ্গে কংগ্রেসের কাছে বড় আকারের পরাজয় বরণ করেছে, আর মনিপুর ও গোয়ায় তারা দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হলেও কোয়ালিশন করে সরকার গঠন করেছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, মোদি ঝড়ে কি আরো উত্তাল হয়ে উঠবে ভারত? নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে কি ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার শেষ নিশানাটুকু? ভারত কি তাহলে খোলাখুলি হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে?

ভারতের পাঁচ রাজ্যের ভোট ও দুই রাজ্যের (মহারাষ্ট্র ও ওড়িশা) পৌর ও পঞ্চায়েত নির্বাচনী ফলাফলে যে সাধারণ চিত্র ফুটে উঠেছে তাতে হিন্দুত্ববাদীদের বড়মাপের জয় হয়েছে–এ নিয়ে কোনো সংশয় নেই। এই ঘটনার রাজনৈতিক ময়নাতদন্তে নেমে নানা কারণের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে, যেমন–জাতীয় কংগ্রেসের সাংগঠনিক দুর্বলতা, মধ্যবর্তী বর্ণগুলোর সাথে দলিত ও মহাদলিত সম্প্রদায়ের বিচ্ছেদ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দোদুল্যমান অবস্থান প্রভৃতি। আবার সাথে সাথে অনেকে একথাও স্মরণে রাখতে চাইছেন যে এটি হিন্দুত্ববাদীদের তাৎক্ষণিক নির্বাচনী বিজয় নয়, এটি তাদের রাজনৈতিক বিজয়। ২০১৪ সালে মোদির হাত ধরে হিন্দুত্ববাদের যে রাজনৈতিক জয়যাত্রা সূচিত হয়েছিল, ২০১৭ সাল তাকে আরেক উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে।

ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার ভাবাদর্শকে কংগ্রেস যতই পেছন থেকে ছুরি মারুক না কেন, কংগ্রেসই এখনও মানুষের কাছে সেদেশের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক। বামপন্থীরা ধর্মনিরপেক্ষতার সবচেয়ে আপোসহীন যোদ্ধা হলেও তাদের শক্তিহীনতা মূল রাজনৈতিক পরিসর থেকে তাদের হটিয়ে দিয়েছে। তবে বিজেপি যেভাবে ভারতকে কংগ্রেসশূন্য করতে চাইছে, তা তারা পারছে না। উত্তর প্রদেশের যে বারানসীতে মোদি তিন দিন ধরে ঘাঁটি গেড়ে বসে প্রচার চালিয়েছিলেন, সেই বারানসী শহরের তিনটি আসনেই কংগ্রেস দ্বিতীয়। রাজ্যে মোট ৪৮টি আসনে কংগ্রেস দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। পাঞ্জাবে তারা সরকার গঠন করেছে, মনিপুর-গোয়ায় তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। তাই মোদির 'কংগ্রেসমুক্ত ভারত' সফল হবে কি না সন্দেহ।

> সংখ্যালঘুর স্বার্থরক্ষার নাম করে তারা মুসলমান মৌলবাদীদেরও প্রশ্রয় দেয়, সেকথা কখনই অস্বীকার করা যায় না। ওই কাজ করতে গিয়ে তাদের মধ্যে অনেকে তিন-তালাক প্রথাও সমর্থন করেছেন। একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিজেপি তিন-তালাক প্রথার বিরোধী হওয়ার কারণে অনেক মুসলমান নারীও তাদের ভোট দিয়েছে।

এবারের নির্বাচনে লক্ষণীয় বিষয় হলো প্রচারের ঝলকানিতে বিকাশ, জাতীয়তাবাদ, পাকিস্তান বিদ্বেষ, শ্মশান-কবরস্থান, হিন্দু সরকার এবং সর্বোপরি নোট বাতিল গরিবদরদি, ধনীবিরোধী ইত্যাদি বিষয়ে মোদির বক্তব্যই একমাত্র বিবেচ্য হয়েছে। বিরোধী দলগুলো এই ফাঁদে পা দিয়ে এসব অভিযোগের নিজের মতো উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেছে, যেমন–মায়াবতী একশ মুসলমান প্রার্থী দেয়ার কথা বলে মেরুকরণকেই জোরদার করেছেন, সমাজবাদী পার্টি-কংগ্রেস সংখ্যাগুরু ভোট হারানোর ভয়ে দ্বিধাগ্রস্ত নিরপেক্ষ উন্নয়নের কথা বলার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু মোদির উন্নয়নের ও মেরুকরণের বিকল্প কোনো ভাষ্য তুলে ধরতে পারেননি। অথচ অন্তত নোট বাতিলে মানুষের নিদারুণ দুর্দশার কথা তুলে ধরে জনমত গঠনের সম্ভাবনা নভেম্বর মাস থেকেই বিদ্যমান ছিল। বিরোধীরা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেননি।

সর্বাপেক্ষা জনবহুল রাজ্য উত্তর প্রদেশে বিজেপির সাফল্য ভারতের কর্পোরেট লবিকে যারপরনাই উল্লসিত করেছে সন্দেহ নেই। কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত সংবাদ ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলোতে লাগামছাড়া চাটুকারিতা। এক মোদিময় ভারতের কল্পময় চিত্রনাট্য তৈরি করতে চাইছে কর্পোরেট দুনিয়া। মোদির এই জয় নাকি তাঁর উন্নয়নের মডেলের জয়-জাতপাত-নির্বিশেষে মানুষ এই উন্নয়নের পক্ষে কাতারে কাতারে ভোট দিয়েছে। প্রকৃত চিত্র কী? মোদির বিজেপি ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল মোট প্রদত্ত ভোটের ৩১ শতাংশ পেয়ে। অর্থাৎ ৬৯ শতাংশ ভোটদাতা বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল। বস্তুত স্বাধীন ভারতে এত কম ভোট পেয়ে আর কোনো দল লোকসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি।

অবশ্য লোকসভা নির্বাচনে উত্তর প্রদেশে বিজেপি এর চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছিল–৪২.৬৩ শতাংশ। তিন বছর রাজত্বের পর বিজেপি ভোটের ভাগ এবারের বিধানসভা নির্বাচনে প্রায় ৩ শতাংশ কমে হয়েছে ৩৯.৭ শতাংশ। রাজ্যের মোট নথিভুক্ত ভোটারের মধ্যে বিজেপিকে সমর্থন জানিয়েছে মাত্র ২৫ শতাংশ। অন্য বিরোধী দলকে ভোট দিয়ে বিজেপির বিরোধিতা করেছে ৩৫ শতাংশ এবং ৪০ শতাংশ নীরব থেকেছে। সুতরাং বলা চলে, মোদি ঝড় একটু হলেও তীব্রতায় হ্রাস পেয়েছে।

উপরোক্ত পরিসংখ্যান প্রমাণ করে, উত্তর প্রদেশের বেশির ভাগ মানুষ বিজেপির বিপক্ষে ভোট দিয়েছে। তারা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত নীতির বিপক্ষে রায় দিয়েছে। কিন্তু সেই ভোট বিভিন্ন দলের মধ্যে বিভাজিত হয়ে যাওয়ায় বিজেপির জয়ের পথ সুগম হয়েছে। এদিকে ধর্মীয় মেরুকরণই যে উত্তর প্রদেশে বিজেপির প্রধান হাতিয়ার, তা আরো স্পষ্ট হয়েছে একজনও মসুলমানকে

প্রার্থী না করার মধ্য দিয়ে; যদিও রাজ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ২০ শতাংশের কাছাকাছি। মন্ত্রিসভায় কোনোমতে একজন শিয়াপন্থী মুসলিমকে রাখা হয়েছে। মূলত উত্তর প্রদেশের নির্বাচন সাম্প্রদায়িক লাইনে বিভাজিত হয়ে গেছে। বর্ণহিন্দুদের পুরো সমর্থন পেয়েছে বিজেপি।

সারা ভারতে মোদি অনুসৃত নব্য-উদারতাবাদের যে লাগামছাড়া ঘোড়া ছুটছে তার নিচে পদদলিত হচ্ছে কৃষকরা। ভয়াবহ কৃষি সংকট চলছে ভারতে। কৃষকের আত্মহত্যা ঠেকানো যাচ্ছে না। উত্তর প্রদেশও এই সংকট থেকে মুক্ত নয়। সেখানে আখচাষিদের মধ্যে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। তারপরও বিজেপি জিতল কী করে? এর মূল কারণ পূর্বতন শাসকদলের সীমাহীন ব্যর্থতা। তারা কোনো ধরনের উন্নয়নই ঘটাতে পারেনি। এই সুযোগে বিজেপি কৃষি অঞ্চলগুলোতে উন্নয়নের বিভিন্ন চমকদারি প্যাকেজের মুলা ঝুলিয়েছে কৃষকদের সামনে। আর আখচাষিদের মধ্যে কৃত্রিম সাম্প্রদায়িক বিভাজনের সুযোগও নিয়েছে তারা।

আরেকটি ভয়াবহ সম্ভাবনার কথা শোনা গেছে উত্তর প্রদেশের নির্বাচনে। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো যে সংখ্যালঘুর স্বার্থরক্ষার নাম করে ক্ষেত্রবিশেষ মুসলমান মৌলবাদীদেরও প্রশ্রয় দেয়, সেকথা কখনই অস্বীকার করা যায় না। ওই কাজ করতে গিয়ে তাদের মধ্যে অনেকে তিন-তালাক প্রথাও সমর্থন করেছেন। একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিজেপি তিন-তালাক প্রথার বিরোধী হওয়ার কারণে অনেক মুসলমান নারীও তাদের ভোট দিয়েছে। বস্তুত, এই জঘন্য তিন-তালাক প্রথা নিয়ে যাদের সবচেয়ে বেশি সরব হওয়া উচিত ছিল সেই বামপন্থীরাও এ বিষয়ে প্রচণ্ড দ্বিধাগ্রস্ত। বিজেপি উত্তর প্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী করেছে কট্টর হিন্দুত্ববাদী যোগী আদিত্যনাথকে। প্রকৃতপক্ষে বিজেপি যে হিন্দুত্ববাদকেই প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে তার আলামত পাওয়া গেছে উত্তর প্রদেশে।

পার্শ্ববর্তী রাজ্য উত্তরাখণ্ডেও (এই রাজ্যটি আগে উত্তর প্রদেশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল) মোদি ঝড়ে বিপর্যস্ত হয়েছে কংগ্রেস। সেখানে ৭০টি আসনের মধ্যে ৫৭টি দখল করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। পাঞ্জাবে শাসকজোট আকালি-বিজেপি পর্যুদস্ত হয়েছে। আকালি দলের কুশাসন, ব্যাপক দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, যুবসমাজে মাদক ব্যবসার রমরমা সংকটগ্রস্ত পাঞ্জাব রাজ্যের জনজীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। শাসকদের পরাজয়ে তা আবারও স্পষ্ট হলো। পাঞ্জাব ও গোয়াকে ঘিরে আম আদমি পার্টির উচ্চাশা ছিল। কিন্তু গত নির্বাচনে কর্পোরেট শক্তির প্রচ্ছন্ন মদদপ্রাপ্ত দলটি এবার সেরকম সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। দলটির স্পষ্ট কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ নেই। সংহত কাঠামোর অভাব রয়েছে, নেতৃত্বের সংকট প্রবল। সর্বোপরি যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের প্রচার ছিল, সেই দুর্নীতিই তাকে গ্রাস করেছে। গোয়া ও মনিপুরে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করে কংগ্রেস সরকার গঠন করতে পারল না এবং এই দুটি রাজ্যে বিজেপি দ্বিতীয় হয়েও সরকার গঠন করল এর প্রধান কারণ রাজ্যগুলোর রাজ্যপালের পক্ষপাতমূলক আচরণ। রাজ্যপালরা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি সীমাহীন আনুগত্য দেখিয়ে বিজেপিকে সরকার গঠনে সহায়তা করেছে। এটি ভারতের গণতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ। মনিপুরে অবশ্য তৃণমূল বিধায়কের আস্থা ভোটও সরকার গঠনে সহায়তা করেছে বিজেপিকে। এর মাধ্যমে বিজেপি-তৃণমূল আঁতাত আবার প্রকাশ্যে এলো। এছাড়া ওই দুটি রাজ্যে অর্থ দিয়ে আঞ্চলিক দলগুলোকে কিনে নিয়েছে বিজেপি।

বিজেপি এখন তিনমুখী নীতি নিয়েছে। বামপন্থীরা যেহেতু মতাদর্শগত শত্রু, সুতরাং তাদের নিকেশ করো (গত বছর কেরালায় ক্ষমতায় আসার পরে রাজনৈতিক হত্যায় মোট ১১ জনের মধ্যে ৭ জন বামপন্থী আরএসএসের হাতে নিহত হয়েছে); কংগ্রেস যেহেতু মূল প্রতিদ্বন্দ্বী, সুতরাং তাদের রাজনীতির মঞ্চ থেকে হটিয়ে দাও এবং বাকি আঞ্চলিক দলগুলোকে হুমকি দিয়ে দলে টানো অথবা কিনে নাও।

বিজেপি এখন তিনমুখী নীতি নিয়েছে। বামপন্থীরা যেহেতু মতাদর্শগত শত্রু, সুতরাং তাদের নিকেশ করো (গত বছর কেরালায় ক্ষমতায় আসার পরে রাজনৈতিক হত্যায় মোট ১১ জনের মধ্যে ৭ জন বামপন্থী আরএসএসের হাতে নিহত হয়েছে); কংগ্রেস যেহেতু মূল প্রতিদ্বন্দ্বী, সুতরাং তাদের রাজনীতির মঞ্চ থেকে হটিয়ে দাও এবং বাকি আঞ্চলিক দলগুলোকে হুমকি দিয়ে দলে টানো অথবা কিনে নাও।

ভারতে বিজেপি আজকে যে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তার সূচনা হয়েছিল সাভারকরের হাত ধরে। তিনি তত্ত্ব দিলেন, ভারত হলো হিন্দুদের ভূমি। অন্য সব ধর্মের মানুষ ভারতে থাকতে পারবে তবে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে। তাদের নাগরিক অধিকার থাকবে না। তিনি আরো বললেন, ভারতকে দখল করেছিল ইসলামিক শক্তি। তাদের বিতাড়িত করতে হবে। অথচ তখন বিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ছে সারা ভারত। তিনি সেই ব্যাপারে নিশ্চুপ ছিলেন।

সাভারকরের পর হিন্দুত্বের ধারণা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন বি এস মুঞ্জে। আরএসএস বা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ প্রতিষ্ঠার পেছনে তাঁর বড় ভূমিকা ছিল। মুঞ্জের বাড়িতেই আরএসএসের প্রতিষ্ঠাতা হেগড়েওয়ার থাকতেন। মুঞ্জে ইতালিতে গিয়েছিলেন, মুসোলিনির সঙ্গে দেখা করেছিলেন। মুঞ্জে দেখেছিলেন কিভাবে ফ্যাসিস্ট ব্রিগেডকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তিনি বলেছিলেন, ঠিক এইভাবেই হিন্দুত্ব ব্রিগেডকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তিনিই পুনেতে ভোনসালা মিলিটারি একাদেমি শুরু করেন। ১৯২৫ সালে হেগড়েওয়ার আরএসএস প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬০-এর দশকে বিশ্ব হিন্দু মহাসভা গঠিত হয়। আজকের যে বিজেপি তা আরএসএসেরই রাজনৈতিক মঞ্চ।

এই সাম্প্রদায়িক শক্তি ভারতীয় বহুত্ববাদকে অস্বীকার করে। এমনকি তারা হিন্দু ধর্মের বৈচিত্র্যকেও অস্বীকার করে। যেমন–রাবণায়ন বলে হিন্দু ধর্মের একটি ধারা রয়েছে। তা রামায়ণের মতোই দীর্ঘ, ততই শোক রয়েছে, ততই পরিচ্ছেদ রয়েছে। সেই কাহিনিতে ভালো-মন্দ নেই, নায়ক-খলনায়ক নেই,

রাবণের কথা। রামায়ণে বলা হচ্ছে, রাবণ ছিলেন শিবের উপাসক। শিব যখন বর দিতে চাইলেন, রাবণ বললেন তিনি অমরত্ব চান, কোনো মানুষ বা পশু যাতে তাঁকে হত্যা করতে না পারে। শিব বললেন, তথাস্তু। বৃদ্ধ হলে রাবণ মোক্ষ অর্থাৎ মুক্তি চাইলেন। কিন্তু তার জন্য তো তাঁকে মরতে হবে। রাবণায়নে বলা হয়েছে, নারদ এসে বললেন মোক্ষের একমাত্র পথ হচ্ছে দেবতারা যদি তাঁকে মারেন। রামের চেহারায় দেবতা আসবেন। নারদ বুদ্ধি দিলেন, এমন কিছু করো যাতে রাম আসে, যুদ্ধ করো, মরে যাও। সেখান থেকেই রামায়ণের কাহিনি শুরু। রাবণ সীতাকে অপহরণ করলেন কিন্তু তাঁর সঙ্গে কোনো খারাপ আচরণ করলেন না। রাবণায়নের মতে, শুধু রামকে লঙ্কা পর্যন্ত টেনে আনতেই তিনি সীতাকে অপহরণ করেছিলেন। বিভীষণকে পাঠালেন রামকে জানাতে যে ঠিক কোথায় তীর ছুড়লে রাবণের মৃত্যু হবে এবং তিনি মোক্ষ লাভ করবেন। দক্ষিণ ভারতে ও শ্রীলঙ্কায় রাবণের মন্দির রয়েছে। তারাও হিন্দুই। হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্যে এমন বৈচিত্র্য রয়েছে।

ভারতের একটি অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য আছে। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বলেছিলেন তিনি ভবিষ্যতের ভারতকে দেখতে চান ইসলামিক শরীর এবং বেদান্ত মনের মিলনে। দারাশিকো তাঁর বিখ্যাত মাজমা-উল-বাহারিনে সুফিবাদ ও উপনিষদের সমন্বয়ের কথা লিখেছিলেন। বিজেপির উত্থানে আজ এই ধর্মীয় সমন্বয় বিপন্ন।

ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে স্বাধীন হলেও তাদের লগ্নিপুঁজি ভারতে থেকে গিয়েছিল। আর স্বাধীনতার পর আরো সাম্রাজ্যবাদী লগ্নিপুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। বিকশিত হয় বৃহৎ পুঁজিপতি শ্রেণি। নেহরু থেকে ইন্দিরা গান্ধী–সব সরকারের আমলেই এই শ্রেণির বাড়বাড়ন্ত চলতে থাকে। ১৯৮০-এর দশকে ভারতের অর্থনীতি নব্য-উদারতাবাদের দিকে ঝোঁকে। তা আরো পাকাপোক্ত হয় নব্বইয়ের দশকে কংগ্রেসের রাও জামানায়। তখন বিজেপি ছিল এই উদারীকরণের আরো আগ্রাসী সমর্থক। ফিন্যান্স পুঁজির পাহারাদার হিসেবে কংগ্রেস আর বিজেপির কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। উভয়েই নব্য-উদারতাবাদের বৃহৎ কাণ্ডারি।

নব্য-উদারতাবাদ উপজাত দুর্নীতির কারণে জনপ্রিয়তা হারিয়ে কংগ্রেস নির্বাচনী পরাজয় বরণ করে। 'দুর্নীতিমুক্ত সুশাসনে'র স্লোগান দিয়ে ক্ষমতায় এসে বিজেপি কর্পোরেট সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম করেছে। বাড়ানো হয়েছে গ্যাস সিলিন্ডারের দাম, বিভিন্ন পরিষেবা কর এবং রেলের ভাড়া। বাড়ানো হয়েছে চিনির ওপর আমদানি শুল্ক, শতাংশের বিচারে দ্বিগুণেরও বেশি। আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে জমি, জীবন-জীবিকা, শ্রম, খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার, সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের অধিকার, মহিলাদের অধিকার ইত্যাদির ওপরও।

মোদি দুঃসাহস দেখিয়ে কৃষকের সম্মতি ছাড়াই কর্পোরেট দুনিয়াকে জমি গ্রাস করার ক্ষমতা দিতে চেয়েছিলেন জমি অর্ডিন্যান্স জারি করে। সংসদের ভেতরে-বাইরে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সামনে পিছু হটতে হয়েছে তাঁকে। গ্রামে এক শ দিনের কাজের প্রকল্পকে সংকুচিত করা হয়েছে। ঢালাও বেসরকারীকরণ, বিলগ্নীকরণ, কর্মী ছাঁটাই, প্রকল্প ছাঁটাই চলছে। তাঁর অনুগত ব্যক্তিদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদে বসাচ্ছেন। একেবারেই যোগ্যতা না থাকা, একদা মহাভারত সিরিয়ালের এক অভিনেতাকে পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের মাথায় বসিয়ে দেয়া হয়েছে। এরকম সংঘীকরণ চলছে সর্বত্র। ইতিহাস বিকৃতি চলছে সমান তালে, শিক্ষাব্যবস্থাকে গেরুয়াকরণ করা হচ্ছে। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে গীতার সংযোজন হয়েছে। দুর্নীতির কেলেঙ্কারিতে গোটা ভারত সয়লাব। হত্যা করা হয়েছে দাভোলকার, গোবিন্দ পানসারে ও কালবুর্গির মতো বুদ্ধিজীবীদের।

ভারতে যেরকম সাম্প্রদায়িক শক্তির বাড়বাড়ন্ত তা আমাদের বাংলাদেশের জন্যও অশনিসংকেত। এখানেও সাম্প্রদায়িক শক্তির আস্ফালন আরো বৃদ্ধি পাবে। ইতিমধ্যে এদেশের সরকার তাদের পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেছে। তাই উভয় দেশেই বামপন্থীদের উত্থান খুবই জরুরি। বামপন্থাই পারে এই অপশক্তিকে প্রতিরোধ করতে।

অনিন্দ্য আরিফ: লেখক, রাজনৈতিক কর্মী
ই-মেইল : anindyaarif1981@gmail.com